পরিশিষ্ট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও কর্ম

জন্মতারিখ	:	মার্চ ১৭, ১৯২০
জন্মস্থান	:	টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ জেলা, বাংলাদেশ
মৃত্যুতারিখ	:	আগস্ট ১৫, ১৯৭৫
মৃত্যুস্থান	:	ঢাকা, বাংলাদেশ
আন্দোলন	:	বাংলা ভাষা আন্দোলন
		ছয় দফা আন্দোলন
		বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন
উপাধি	:	বঙ্গবন্ধু
প্রধান সংগঠন	:	আওয়ামী লীগ
উল্লেখযোগ্য পদ:		বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী
স্মরণীয় অর্জন	:	জুলিও কুরি পুরস্কার
		নেতাজী সুভাষচন্দ্র পদক (মরণোত্তর)

শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পুরো এবং বাংলাদেশের জাতির জনক হিসেবে বিবেচিত। তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি "শেখ মুজিব" নামে বেশি পরিচিত এবং তার উপাধি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু। তার কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রী এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন ছাত্রনেতা এবং একই সাথে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। তার বড় গুণ ছিল তুখোড় বক্তৃতা প্রদানের ক্ষমতা। সমাজতন্ত্রের পক্ষসমর্থনকারী একজন অধিবক্তা হিসেবে তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন। তার দাবিগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন যার কারণে তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অন্যতম বিরোধী পক্ষে পরিণত হন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি একসময় ছয় দফা স্বায়ত্বশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন যাকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের সাথে যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তার বিচার হয় এবং পরবর্তীতে তিনি তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৯৭০ সনের নির্বাচনে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করলেও তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয় নি।

পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৭১ সনের মার্চ ২৫ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যা পরিচালনা করে। একই রাতে তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীতে রহিমুদ্দিন খান সামরিক আদালতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর মধ্যে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হন। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র চালনার চেষ্টা সত্ত্বেও তীব্র দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব এবং সেই সাথে ব্যাপক দুর্নীতি মোকাবেলায় তিনি কঠিন সময় অতিবাহিত করেন। অচিরেই সৃষ্টি হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে তিনি সকল

দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যান । এর সাত মাস পরে, ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে একদল সামরিক কর্মকর্তার হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

প্রাথমিক জীবন

শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার (যিনি আদালতের হিসাব সংরক্ষণ করেন) ছিলেন এর মা'র নাম সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তার বড় বোন ফাতেমা বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী; তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। ১৯২৭ সালে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন যখন তার বয়স সাত বছর। নয় বছর বয়সে তথা ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনিস্টিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৩৪ থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ তার চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করাতে হয়েছিল এবং এ থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৩৮ সনে আঠারো বছর বয়সে তার সাথে ফজিলাতুন্নেসার বিয়ে হয়। এই দম্পতির ঘরে দুই কন্যা এবং তিন পুত্রের জন্ম হয়। কন্যারা হলেন শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। আর পুত্রদের নাম শেখ কামাল, শেখ জামাল এর শেখ রাসেল তিনজন পুত্রই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাতে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

রাজনৈতিক জীবনের সূচনা

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। এ বছর স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং পরবর্তিতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবীর উপর ভিত্তি করে একটি দল নিয়ে তাদের কাছে যান যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। সেখানে তিনি এক বছর মেয়েদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সনে এসট্রান্স পাশ করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান নাম মাওলানা আজাদ কলেজ) আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। এই কলেজ থেকে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং অগ্রণী বাঙালি মুসলিম নেতা হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। ১৯৪৩ সনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ সনে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসকারী পর দুপুরবাসীদের নিয়ে তৈরি "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সনে অর্থাৎ দেশবিভাগের বছর মুজিব কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার সময়ে কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এ সময় মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন।

পাকিস্তান-ভারত পৃথক হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি ৪ তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যার মাধ্যমে তিনি উক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। এ সময় সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং জীবনযাত্রার নিম্নমানের উন্নয়নের জন্য এটিকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।

প্রাথমিক রাজনৈতিক তৎপরতা

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারি ২৩ তারিখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন গণ-পরিষদের অধিবেশনে বলেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এই মন্তব্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লীগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। এই বছরের ২ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মিলনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয় যাতে শেখ মুজিব একটি

প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এখান থেকেই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই পরিষদের আহ্বানে ১১ মার্চ ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিবসহ আরও কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীকে সচিবালয় ভবনের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ শেখ মুজিব এবং অন্য ছাত্র নেতাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। এদের মুক্তি উপলক্ষ্যে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার র‍্যালি হয় যাতে মুজিব সভাপতিত্ব করেন। পুলিশ এই র‍্যালি অবরোধ করেছিল। পুলিশী কার্যক্রমের প্রতিবাদে শেখ মুজিব অবিলম্বে ১৭ মার্চ দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। ১৯ মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। এতে ১১ সেপ্টেম্বরে তাকে আবার আটক করা হয়।

১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন যার জন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জরিমানা করা হয়। কিন্তু তিনি এই জরিমানাকে অবৈধ ঘোষণা করে তা আদায় থেকে বিরত থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৬ এপ্রিল মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থী শামসুল হক টাঙ্গাইলে একটি উপনির্বাচনে বিজয় লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু তার সেই আন্দোলনের সফলতার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অনশনের ধর্মঘট করেন যার জন্য তাকে আবার আটক করা হয়। এ সময়ই তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান। ২৩ জুন সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলে পর মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত করা হয়। জুনের শেষ দিকে জেল থেকে ছাড়া পান। ছাড়া পাওয়ার পরই খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে সাময়িকভাবে আটক করে রাখা হলেও অচিরেই ছাড়া পেয়ে যান। এরপর মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে মিলে লিয়াকত আলি খানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের চেষ্টা করায় ভাসানী এবং তাকে আটক করা হয়। এটি ছিল অক্টোবরের শেষদিকের কথা।

১৯৫০ সনের জানুয়ারি মাসে প্রথমদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের পূর্ব পাকিস্তান আগমনকে উপলক্ষ্য করে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঢাকায় দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে এবারও শেখ মুজিব আটক হন। সেবার তার দুই বছর জেল হয়েছিল। ১৯৫২

সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও মুজিব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। জেল থেকে নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পরিচালনায় তিনি ভূমিকা রাখেন। এরপরই ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবী আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একই সময়ে বঙ্গবন্ধু জেলে থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন কার্যকর ছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের শেষে দলের মহাসচিব হন। একই বছরের ১৪ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩ টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল। শেখ মুজিব। গোপালগঞ্জে আসনে ১৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শক্তিশালী মুসলিম লীগ নেতা ওয়াহিদুজ্জামান। ১৫ মে তাকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৯ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়। ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমানবন্দর থেকেই তাকে আটক করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন শেখ মুজিব আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৭ জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে ২১ দফা দাবি পেশ করে যার মধ্য মধ্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৩ জুন দলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জিত না হলে আইন সভার সকল সদস্য পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট পাকিস্তানের করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন :

"Sir [President of the Constituent Assembly], you will see that they want to place the word "East Pakistan" instead of "East Bengal." We had demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word "Bengal" has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. So far as the question of one unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? We

will be prepared to consider one-unit with all these things. So I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite."

২১ অক্টোবর বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের শেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেয়া হয়। মুজিব পুনরায় দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ৩ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠকে দল থেকে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্ত্বশাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানানো হয়। ১৪ জুলাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব রাখা হয় যা তিনিই সরকারের কাছে পেশ করেন। সেপ্টেম্বর মাসের ৪ তারিখ তার নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিল বের হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী এই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়ে একসাথে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে ৩০ মে দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে তিনি মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ৭ আগস্ট সরকারি সফরে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যান। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে মার্শাল ল জারি করে সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই বছরেরই ১১ অক্টোবর তাকে আটক করা হয়। জেলে থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মাথা অভিযোগ আনা হয়। ১৪ মাস একটানা আটক থাকার পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু জেলের ফটক থেকে আবার গ্রেফতার করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতা ১৯৪৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিব

উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করার মাধ্যমে তিনি ১৯৬১ সালে জেল থেকে ছাড়া পান। এবার শুরু করেন গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা। অনন্যসাধারণ ছাত্রনেতাদের নিয়ে গোপনে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা। ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে তাকে আবার আটক করা হয়েছিল। জুনের ২ তারিখে চার বছর ব্যাপী মার্শাল ল অপসারণের পর একই মাসের ১৮ তারিখে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। ২৫ জুন অন্য রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে

নেমে পড়েন। ৫ জুন পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে আইয়ুব খানের সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর লাহোর যান এবং সেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মিলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন। এটি মূলত বিরোধী দলসমূহের একটি সাধারণ কাঠামো হিসেবে কাজ করেছিল। পুরো অক্টোবর মাস জুড়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে মিলে বাংলার বিভিন্ন স্থান সফর করেন এই যুক্তফ্রন্টের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে লন্ডন যান, যান, সোহরাওয়ার্দী সেখানে চিকিৎসারত ছিলেন। এই বছরের ৫ ডিসেম্বর তিনি বৈরুতে মৃত্যুবরণ করেন।

সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই বৈঠকের প্রস্তাবের ভিত্তিতে শেখ মুজিব তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের মহাসচিব ও মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১১ মার্চ মার্চ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় যার মাধ্যমে মুজিব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সেনাশাসক আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসিস প্ল্যান, সামরিক শাসন এবং এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রদেশগুলোকে একত্রে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কাজ করতে গিয়ে, মুজিব আইয়ুব বিরোধী দল প্রার্থী ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করেন। যথারীতি নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে তাকে আটক করা হয়। তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং আপত্তিকর প্রস্তাব পেশের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অবশ্য উচ্চ আদালতের এক রায়ে তার আগেই তিনি মুক্তি পেয়ে যান। এ সময় সামরিক বাহিনীর গণহত্যা আর বাঙালিদের চাহিদা পূরণে সামরিক শাসকদের ঔদাসীন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

ছয় দফা দাবি

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা উল্লেখিত হয়েছিল। শেখ মুজিব এই দাবীকে "আমাদের বাঁচার দাবী" শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবীর মূল বিষয় ছিল একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানী ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন এই দাবী সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত

করেন। এ কারণে তিনি এই সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। মার্চ মাসের এক তারিখে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেন। প্রায় পুরো দেশই ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে বন্দী হন। বছরের প্রথম চতুর্থাংশেই তাকে আটবার আটক করা হয়েছিল। এই বছরের মে ৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জে পাট কারখানার শ্রমিকদের এক র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। তার মুক্তির দাবীতে ৭ জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। পুলিশ এই ধর্মঘট চলাকালে গুলিবর্ষণ করে যার কারণে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে আনুমানিক তিনজনের মৃত্যু হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে জেলে দুই বছর থাকার পর ১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব এবং আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে সুপরিচিত। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরী করেছে। এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামী করা হয় এবং পাকিস্তান বিভাগের এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামীকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এর অব্যবহিত পরেই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এই মামলাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের মানুষ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে। এহেন পরিস্থিতে একই বছরের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অভিযুক্ত আসামীদের বিচারকার্য শুরু হয়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

বিচারকার্য চলাকালীন সময়ে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি ৫ তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগার দফা দাবী পেশ করে যার মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলোই দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গৃহীত হয়। এই সংগ্রাম এক সময় গণআন্দোলনে রূপ নেয়। এই গণআন্দোলনই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। মাসব্যাপী তখন পাকিস্তান সরকার ছাড় দিতে বাধ্য হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের সাথে এক গোলটেবিল

বৈঠকের পর এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এর সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করা হয়। উপাধি প্রদান ঘোষণা দিয়েছিলেন তোফায়েল আহমেদ। এই সভায় রাখা বক্তৃতায় শেখ মুজিব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা দাবির পক্ষে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিব তাঁর ছয়-দফাসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চাহিদাগুলো মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান এবং তা প্রত্যাখ্যাত হলে সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক জনসভায় মুজিব ঘোষণা করেন যে এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে "বাংলাদেশ" নামে অভিহিত করা হবে :

"একটা সময় ছিল যখন এই মাটি আর মানচিত্র থেকে "বাংলা শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। "বাংলা" শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে "বাংলাদেশ" ডাকা হবে"।

মুজিবের এই ঘোষণার ফলে সারা দেশে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্তারা তাঁকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে মূল্যায়িত করতে শুরু করেন। মুজিবের বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। অনেক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বের মতে, বাঙালিদের আন্দোলন দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বাঙালিদের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত এই আত্মপরিচয় তাদেরকে একটি আলাদা জাতিসত্ত্বা প্রদান করে। মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৭০ এর নির্বাচন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক আইনসভায় পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের কোটার ২টি আসন ছাড়া বাকি সবগুলোতে জয়ী হওয়ার জন্য জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে

মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো, মুজিবের স্বায়ত্বশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ভুট্টো এসেম্বলি বয়কট করার হুমকি দিয়ে ঘোষণা দেন যে, ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি সে সরকারকে মেনে নেবেন না।

রাজনৈতিক অস্থিশীলতার মধ্যে ইয়াহিয়া খান সংসদ ডাকতে দেরি করছিলেন। বাঙালিরা এতে বুঝে ফেলে যে, মুজিবের দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে দেয়া হবে না। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুজিব স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন।

ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন, আওয়ামী লগিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে, মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ :

"এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক।

মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফয়সালবাদের একটি জেলে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান মুজিবের মামলার পরিচালনা করেন। মামলার আসল কার্যপ্রণালী এবং রায় কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় নি।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিচালিত অভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই হিংস্রতা ও তীব্র রক্তপাতে রূপ নেয়। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে। বাঙালি ও অবাঙালি হিন্দুদেরকে লক্ষ্য করে বিশেষ অভিযানের কারণে সারা বছরজুড়ে প্রচুর হিন্দু জনগোষ্ঠী সীমান্ত অতিকরম করে পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ও পুলিশ রেজিমেন্টে কর্মরত পূর্ব বাংলার সদস্যবৃন্দ দ্রুতই বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং লীগ সদস্যবৃন্দ কলকাতায় তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্ব প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি বাহিনীর নেতৃত্ব বড় রকমের

বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তাঁর সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

যুদ্ধবর্তী সময়ে মুজিবের পরিবারকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। তাঁর সন্তান শেখ কামাল মুক্তি বাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর ভিতরে সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ নাম পরিচিত। ১৯৭১ সালে ভারতীয় সরকারের অংশগ্রহণের পর, পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং লীগ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় সরকার গঠন করেন। পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ মুজিবকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তিদান করে। এরপর তিনি লন্ডন হয়ে নতুন দিল্লিতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে ভারতের জনগণ, আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে তাঁকে সাধুবাদ জানান। তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। সেদিন তিনি ঢাকায় জড়ো হওয়া প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের সামনে বক্তৃতা দেন।

বাংলাদেশের শাসন

শেখ মুজিবুর রহমান অল্পদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭০ এ নির্বাচিত রাজনীতিবিদরা নতুন রাষ্ট্রের অন্তবর্তী সংসদ গঠন করেন। মুক্তিবাহিনী এবং অন্যান্য মিলিশিয়াদের নিয়ে নতুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠিত হয় এবং ১৭ মার্চ ভারতীয় বাহিনীর কাছ থেকে ক্ষমতা বুঝে নেয়।

বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর মুজিব জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের জন্য মানবীয় ও উন্নয়নকল্পের জন্য সহযোগিতা চান। তিনি ভারতের সাথে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মুজিব ইন্দিরা গান্ধির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন। মুজিবের জীবদ্দশায় দুই সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ছিল।

হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল তরুণ সেনা কর্মকর্তা ট্যাঙ্ক দিয়ে রাষ্ট্রপতির ভবন ঘিরে ফেলে এবং শেখ মুজিব, তাঁর পরিবার এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারিদের হত্যা করে। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করার কারণে বেঁচে যান। তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে

নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের সদস্য এবং সামরিক কর্মকর্তারা। এদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবের প্রাক্তন সহকর্মী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সংবাদমাধ্যমে এ ঘটনার ইন্ধনদাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে দায়ী করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বুস্টারের বরাত দিয়ে লরেন্স লিফসুলজ সি আইএ কে অভ্যুত্থান ও গণহত্যার জন্য দোষারোপ করেন।

মুজিবের মৃত্যু বাংলাদেশকে বহু বছরের রাজনৈতিক সংঘাতের দিকে টেনে নেয় সেনাঅভ্যুত্থানের নেতারা অল্পদিনের মধ্যেই উচ্ছেদ হয়ে যান এবং অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে দেশ অচল হয়ে পড়ে। ১৯৭৭ সালে আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা দখলের পর শৃঙ্খলা অনেকাংশে ফিরে আসে। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করার পাশাপাশি ইনডেননিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে মুজিবের হত্যার সাথে জড়িতদের বিচার বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ১৪ জন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিরা বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যায় বিচারের পথ সুগম করে। নিম্ন ও উচ্চ আদালতের রায়ের পরে শেখ মুজিবের খুনিদের ফাঁসির আদেশ বর্তমানে কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার প্রধান নায়ক বলে এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। এছাড়া তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের দিন পনের আগস্টকে *জাতীয় শোক দিবস* হিসেবে পালনের নির্দেশও প্রদান করেন।

২০০৪ সালে বিবিসি'র বাংলা রেডিও সার্ভিসের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে যে জরিপ চালানো হয়, তাতে মুজিব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিবেচিত হন।

সূত্র : উইকিপিডিয়া

সহায়ক গ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্র :

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড)- এম. নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, পরিবেশক– জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা; যথাক্রমে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ও ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

২. মহাকালের মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সম্পাদনায়– শাফিকুর রাহী, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, আগস্ট ২০০৯।

৩. বঙ্গবন্ধু, মিজান রহমান সম্পাদিত, ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

৪. মাসিক উত্তরাধিকার (বঙ্গবন্ধু স্মরণ সংখ্যা, আগস্ট ২০০৯), শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত।

৫. বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতা; আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, আগস্ট ২০০৯।

৬. সংবিধান : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

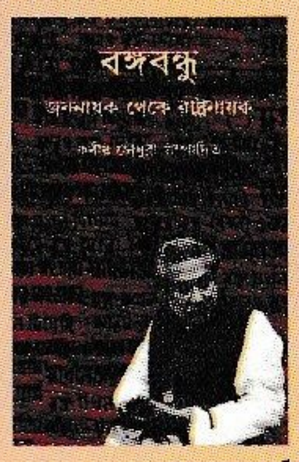
৭. বিভিন্ন সংবাদপত্র।

৮. বিভিন্ন সাময়িকপত্র।

৯. ইন্টারনেট।

১০. ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

শেখ হাসিনা	ড. মো. মাহবুবর রহমান
শামসুর রাহমান	ফারুক চৌধুরী
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	আবুল হাসান চৌধুরী
ড. কামাল হোসেন	ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
গাজীউল হক	ড. সুকুমার বিশ্বাস
কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী	মাহবুব উদ্দিন আহমদ
ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ	মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
শামসুজ্জামান খান	সুলতান মাহমুদ শরীফ
কে এম সোবহান	ড. মোহাম্মদ শাহাদত আলী
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য
খোন্দকার মোজাম্মেল হক	ড. সেলিম জাহান
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ
কবীর চৌধুরী	এ কে আজাদ চৌধুরী
আনিসুজ্জামান	ড. অজিত কুমার দাস
সালাহ্উদ্দীন আহমদ	ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া
মুনতাসীর মামুন	ড. মো. রফিকুল ইসলাম
স্বদেশ রায়	আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া
বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন	শাহ এ. এম. এস. কিবরিয়া
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	আবুল মাল আবদুল মুহিত
আব্দুল হালিম	ড. আতিউর রহমান
অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম	হাশেম খান
রামেন্দ্র চৌধুরী	তপন বাগচী
হোসেন তওফিক ইমাম	আনু মাহ্মুদ
অধ্যাপক ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	খালেক বিন জয়েনউদদীন
কামরুদ্দীন আহমদ	সেলিনা হোসেন
অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	আহমাদ মাযহার



Bangabandhu
Jononayok Theke Rastronayok
Edited by Kobir Chowdhury
Cover design : Sabbsachi Hajra
Price Bdt : 500.00 Only US$: 25.00
Printed in Bangladesh
www.anneshaprokashon.com

অন্বেষা
an Annesha Prokashon
Publication
ISBN 984 70116 0126 7
9 847011 601267